করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোদীর জনপ্রিয়তা কমাতে পারল কি?

জহর সরকার

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দশা দেখে অনেকেই মনে করছেন তাঁর দিন বোধহয় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু না, এখনও অবধি এই পুলকের সত্যি কোনও কারণ নেই। অতিমারি মোকাবিলায় তাঁর চূড়ান্ত ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রথমে সীমিত ছিল শহরবাসীদের মধ্যে। দোরগোড়ায় মৃত্যুর তাণ্ডব দেখে তাঁরা আতঙ্কিত হন। আর এই মারাত্মক সংক্রমণ তাঁদের প্রতিষ্ঠা, প্রভাব ও ক্ষমতাকে কোনও পাত্তাই দেয়নি। এর কিছু পর, দিনের পর দিন, সকাল সন্ধে সারিবদ্ধ জ্বলন্ত চিতার দৃশ্য আর গঙ্গায় ভাসমান লাশ বা নদীর চরে পোঁতা শব দেখে সারা দেশের মানুষই বিস্মিত হলেন। বহু দিন পর এ রকম রোষের ব্যাপ্তি প্রতিফলিত হল সারা দেশে— রাজনীতি-নির্বিশেষে, এতটাই যে ভারতের পোষা মিডিয়াও শেষ পর্যন্ত সত্য প্রকাশ করতে বাধ্য হল এবং বলা বাহুল্য, তাতে প্রভু যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলেন। আন্তর্জাতিক মিডিয়া তো আরও নির্দয় আকারে মোদীর উজ্জ্বল ছবিকে কালিমালিপ্ত করল।

Advertisement

Video Player is loading.

Current Time 0:09

Duration 10:03

Remaining Time 9:54

UNIBOTS

তবে একটি নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মোদীর জনপ্রিয়তা কমলেও তা ৭৪ শতাংশে। সেটি ছিল জানুয়ারি মাসে যখন দেশবাসীকে বলা হয়েছিল যে মোদীর দৌলতে ভারত করোনা জয় করে ফেলেছে। তার ঠিক পরেই দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় এই মায়াজাল বিদীর্ণ হওয়ার পর আমেরিকার এক তথ্য বিশ্লেষণকারী সংস্থা তথ্য অনুযায়ী গত বছরের ৩০ মে থেকে চলতি বছরের ৩০ মে পর্যন্ত এক বছরে মোদীর জনপ্রিয়তা ৮২% থেকে ৬৩% হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২০১৪-র ভোটের ৩১.১% বা ২০১৯-এর ৩৭.৪% থেকে উনি এখন অনেকটাই এগিয়ে আছেন।

যাঁরা মোদীর এই ভাবমূর্তি নষ্ট হতে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন, তাঁদের একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, তাঁর হাতে কিন্তু এখনও একটি বিশাল, সম্পদশালী ও মজবুত নির্বাচনী যন্ত্র আছে। এই বিক্ষোভ তার উপর কোনও

প্রভাব ফেলতে পারবে না। হ্যাঁ, তাঁর কিছু সমর্থক অবশ্যই কমে গেছে—— কিন্তু এদের বেশির ভাগই জুটেছিল ২০১৪-র পর। হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা এর মোকাবিলা করতে আরও তৎপর হয়ে উঠেছে ও প্রচার যন্ত্রকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আরও শাণিয়ে তুলেছে। মিডিয়ার বৃহৎ অংশটি সুবিধেবাদী, অতএব তারা পুনরায় প্রভুর ও তাঁর বিত্তশালী পুঁজিবাদী সঙ্গীদের স্তাবকতা শুরু করে দিয়েছে বিনা রাখঢাকে।

সত্যি বলতে কী, একমাত্র আদালতই কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে। তাও হালেই— বিশেষ কয়েক জন বিচারক অবসর নেওয়ার পর— যাঁরা প্রায় খোলাখুলি ভাবেই কেন্দ্র সরকারকে সমর্থন করতেন। এখনও অবশ্য এমন অনেক বিচারক আছেন, যাঁদের নিয়োগ এই প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন— স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের এক অংশের উপর ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বেশি ভরসা করতে পারে না। মাত্র কয়েক দিন আগে যে সর্বোচ্চ আদালত এই সরকারের বিভ্রান্তিকর ও পক্ষপাতপূর্ণ নীতি নস্যাৎ করে বাধ্য করেছেন বিনামূল্যে সকল সাবালক ব্যক্তিকে টিকা দেওয়ার জন্যে— তার জন্য ভারত চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তার ওপর সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় নিঃসন্দেহে মানুষের মনে উৎসাহ সঞ্চার করেছে। যদিও তামিলনাড়ু ও কেরলের ফল আশানুরূপই ছিল। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে মোদীর বিরুদ্ধে এই রায় দেশের দুর্বল হয়ে-আসা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলল।

মোদী-বিরোধী এই মনোভাব কিন্তু করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের পরে টিকে থাকা কঠিন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শীর্ষ নেতা করোনার মোকাবিলা নিয়ে মোদীর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে কঠিন বিবৃতি দিলেও তা নিয়ে আমাদের খুশি হওয়ার মতো কিছু নেই। কারণ, সঙ্ঘ বা বিজেপি দল মোদীকে কখনই চটাবে না। এর প্রধান কারণ হল, মোদীর সঙ্গে গুজরাতের বৃহৎ পুঁজির সম্পর্ক যা অত্যন্ত সুদৃঢ়। ২০১৪ সাল থেকে মোদী নির্বাচন ব্যাপারটিকে অসম্ভব ব্যয়বহুল করে তুলেছেন। একটি হিসেবে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ৬০,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল যা সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নির্বাচনী খরচ— ২০১৪ সালের খরচের দ্বিগুণ। এর ৪৫ শতাংশ বিজেপির। ওই দল মোট ২৭,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে, যার মানে হল বিজয়ী ৩০৩ প্রার্থীর জন্য মাথাপিছু ৮৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সুতরাং এখনকার নির্বাচনের বিপুল ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা আগেকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমর্থকদের দ্বারা আর সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯-এ ইলেক্টোরাল বন্ড স্কিম-এ বিজেপি ৭৫০ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বড় কোম্পানির কাছ থেকে। এই অঙ্ক কংগ্রেসের বন্ডের ১৩৯ কোটি টাকার পাঁচ গুণ বেশি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৮ কোটি টাকা। সম্ভবত ২০১৯-এর নির্বাচনের ফল এত হতাশাজনক হওয়ার এটিও একটি কারণ হয়ে থাকতে পারে।

করোনা ও মোদীর সর্বনাশা নীতির কুফলে যদিও বর্তমানে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা জরাজীর্ণ, সরকারের অনুকূল নীতি, বেসরকারিকরণ, বৃহৎ পরিকাঠামো প্রদান বা খনন সম্বন্ধীয় প্রকল্পের কারণে বেশ কয়েকটি কর্পোরেট গোষ্ঠী লাভবান হয় ও এখনও হচ্ছে। এই শ্রেণি নিশ্চিত রূপে তাদের প্রিয় নেতাকেই সমর্থন করে যাবে। আর এই সুবিধভোগীরা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করায় বিশ্বাস রাখে না অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো। তা ছাড়া অর্থরাশি কেন্দ্রীভূত হলে দলের মন্ত্রী বা আঞ্চলিক নেতাদের ওপর অনায়াসে ছড়ি ঘোরানো যায়। মোদীর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, বাম ও উদারপন্থীরা যত তাড়াতাড়ি এ কথা বুঝবেন ততই মঙ্গল। কেবলমাত্র টুইটার, মিম বা নিজের পিঠ চাপড়ে তাঁকে টলানো কোনও মতেই যাবে না।

মোদীর সবচেয়ে বিপজ্জনক অবদান হল রাজনীতির সঙ্গে ভারতীয় গুরুবাদী ঐতিহ্যের সংযোজন। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রতিটি এলাকার ধর্মীয় প্রধানরা ভক্তদের মানসিক সান্ত্বনা জোগান এবং উপদেশও দিয়ে থাকেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের আঞ্চলিক শাস্ত্রজ্ঞ বা মন্দির পুরোহিতরা এ ধরনের কোনও কাজ করেন না। এর জন্য ভক্তরা যায় গুরুদের কাছে, যাদের কারও কারও অসীম ক্ষমতা ও অবিশ্বাস্য ধরনের প্রভাব। গুরুরা প্রায়

মর্ত্যের দেবতা— সে তিনি কর্পোরেট বাবা রামদেবই হন বা আসারাম বাপুর মতো কলঙ্কিতই হন। পরিকল্পিত ভাবে মোদী তাঁর ভক্তবৃন্দ তৈরি করেছেন যার সংখ্যা কয়েক কোটিরও অধিক। এটি কোনও প্রধানমন্ত্রী করেননি। এমন কোটি কোটি ভারতীয় আছেন, যাঁরা কক্ষনও তাঁদের গুরুর প্রতি অবিচলিত আস্থা হারিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করার কথা ভাবতেই পারবেন না।

এ ছাড়া মোদী কিন্তু দারুণ নির্বাচনী কৌশলবিদ। বাক্‌চাতুর্যে তিনি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারেন। দুঃখের বিষয় হল এই যে, জাতীয় স্তরে ওঁর বিপক্ষে দাঁড়ানোর মতো কোনও নেতা নেই। এমনকি অ-বিজেপি রাজ্য— ওড়িশা, তেলঙ্গানা বা অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীরাও তাঁর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। এবং যাঁরা ওঁর বিপক্ষে, তাঁরাও নিজেদের রাজ্যের সীমাবদ্ধতায় খুশি, যেমন ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র, পিনারাই বিজয়ন ও উদ্ধব ঠাকরে। হয়তো বা মমতার মতো লড়াকু নেতা জাতীয় স্তরে ওঁর বিপক্ষে আবির্ভূত হতে পারেন, যদি ভাষা বা অন্যান্য বাধা অতিক্রম করেন। কিন্তু তাঁকে তাঁর রাজ্যে আটকে রাখার সমস্ত চেষ্টা চালানো হচ্ছে। জনতার বিশাল রায় পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। সব সময় আতঙ্ক থাকে— এই না সাম্প্রদায়িক শক্তিরা কোথাও দাঙ্গা বাধায়।

এর পরের লড়াইয়ের ময়দান আদিত্যনাথের অত্যাচারে জর্জরিত উত্তরপ্রদেশ। এ বছরের পঞ্চায়ত নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির ফল প্রশংসনীয় কিন্তু একলা জেতা তার পক্ষে অসম্ভব। যদিও নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতে, এখনও পর্যন্ত বিজেপির বিপক্ষে দাঁড়ানোর কোনও যৌথ প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। এ ছাড়া কৃষকদের মোদী বিরোধী আন্দোলন ও নাগরিকত্ব আইনের শিখা এখনও জ্বলছে।

এত বাধা সত্ত্বেও মানুষ যদি নিজেদের মূল্যবোধ রক্ষার্থে একত্র হন, সেটা আলাদা কথা। এই কারণে বাংলার তর্কপরায়ণ মানুষ এক হয়ে মোদীকে রোখার জন্যে ৪৮ শতাংশ ভোট দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

আরও পিছনে গেলে দেখতে পাই ১৯৭৭-এর অজেয় ইন্দিরা গাঁধীকে কিন্তু ভারতের জনতা চরম শিক্ষা দিয়েছিল। তাঁর সংগঠন, শক্তি, দৃঢ়তা, অর্থ— কিছুই মানুষের ক্রোধের অপ্রতিরোধ্য সুনামির সামনে দাঁড়াতে পারেনি।

তবে কিনা, এমন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সহজে হয় না। তার জন্য লাগে মানুষের সচেতনতা, সাহস, সংগঠন ও সংগ্রাম।